ইউনিট ১০

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-৭১ খ্রিঃ)

ভূমিকা

দীর্ঘ দু'শো বছর ইংরেজ শাসনের পর ভারত ও পাকিস্তান নামের দু'টি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বাংলা অঞ্চল ধর্মীয় সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কোলকাতাসহ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল ভারতের অধীনে এবং ঢাকাসহ পূর্ব বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পাকিস্তানের অধীনে যুক্ত হয়। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রটি বেশী দিন পর্যন্ত অখণ্ড থাকতে পারেনি। প্রায় দেড় হাজার মাইলের ভৌগোলিক ব্যবধান এবং অধিবাসীদের মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবন জীবিকার মিল থাকা সত্ত্বেও কেবল ধর্মীয় ঐক্যের কারণে দু'টি বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। যাহোক, এই নতুন রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু ভাষী নেতা। সে সময়ের পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশের মানুষের প্রতি তাদের কোন সহানুভূতি ছিল না। তারা শুধু এ দেশকে শোষণ করতে চেয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি তাদের নীতি ছিল বৈষম্যমূলক। জনসংখ্যার দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্য এ অঞ্চলের জনমনে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি করে। ফলে স্বাধিকারের প্রশ্নে এতদাঞ্চলের জনগণকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় শুরু থেকেই। প্রথমেই সূচিত হয় ভাষা আন্দোলন। রক্তের বিনিময়ে পূর্ববাংলা অর্জন করে ভাষার অধিকার। তথাপি পূর্বাঞ্চলের প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। ফলে পূর্ববাংলায় আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে। এরই পথ ধরে দানা বাঁধে ছয় দফা ও এগার দফার আন্দোলন। পরিণতিতে সংঘটিত হয় ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান। পাকিস্তানি শাসনযন্ত্রের ভীত কেঁপে উঠে। তারা নিরস্ত্র পূর্বপাকিস্তানিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। অবশেষে পূর্ব পাকিস্তান অর্জন করে স্বাধীনতা।

পাঠ ১

ভাষা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পটভূমি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করার জন্য কিভাবে বাংলায় আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার ও আরবি হরফে বাংলা লেখার নীতি পাকিস্তান সরকার গ্রহণ করেছিল, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটির ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভাষা আন্দোলনের পূর্বে যে সব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল, তাদের পরিচয় জানতে পারবেন।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকেই বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে পূর্ব বাংলার সাথে। ফলে জনগণকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় প্রতিরোধ আন্দোলনে। প্রতিরোধ আন্দোলনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলো পরের দিকে গুরুত্ব বেশি পেয়েছিল। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় সাংস্কৃতিক প্রশ্ন। বাংলা ভাষার উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলন প্রতিরোধ আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দুতে এসে দাঁড়ায়।

বাংলায় আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার ও আরবি হরফে বাংলা লেখা

'রেনেসাঁ সোসাইটি' ও 'সাহিত্য সংসদ' গঠন

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মের পর মুসলিম লীগের রক্ষণশীল অংশ পূর্ববাংলার ক্ষমতায় বসে। তারা 'রেনেসাঁ সোসাইটি' ও 'সাহিত্য সংসদ' গঠন করে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিশেষ ধরনের নীতি গ্রহণ করে। তারা প্রথমেই বাংলা ভাষার মধ্যে একটি ইসলামী রূপ ফুটিয়ে তুলতে চায়। এ কারণে উৎসাহ দিতে থাকে প্রচুর আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহারের। আরবি হরফে বাংলা লেখার ইচ্ছাও ঘোষণা করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলা ভাষায় আরবি হরফ চালুর চেষ্টা করে। এরপর আরবিতে বাংলা শিক্ষা দেয়া শুরু হয়। চালু হয় এ ধরনের অনেকগুলো শিক্ষাকেন্দ্র। সেখানে বয়স্ক ছাত্রদের বিনামূল্যে আরবি হরফের বই দেওয়া হতে থাকে।

'ভাষা কমিটি' ও পাকিস্তান তমুদ্দুন মজলিশের প্রতিবাদ

তবে অচিরেই পূর্ববাংলার জনগণ বুঝতে পারে পাকিস্তানিদের অসাধু উদ্দেশ্য। তারা আসলে পূর্ববাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চায়। ফলে সরকারের অসৎ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সৃষ্টি হতে থাকে। প্রথমে এগিয়ে আসে পূর্বপাকিস্তান মুসলিম লীগের 'ভাষা কমিটি'। এই কমিটির বক্তব্য হচ্ছে পূর্ববাংলার মানুষকে অশিক্ষিত বানানোর জন্যই শাসকদের এই ষড়যন্ত্র। প্রবল নিন্দা জানায় 'পাকিস্তান তমুদ্দুন মজলিশ'। প্রতিবাদে ফেটে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীসহ অনেকেই।

বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি

আন্দোলনের মুখে প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য একটি ভাষা কমিটি গঠন করে। এর সভাপতি ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এবং সেক্রেটারি ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা। দেড় বছর ব্যাপক আলাপ আলোচনার পর কমিটি সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করে।

'সহজ বাংলা' চালু করার পরামর্শ

রিপোর্টে বাংলা ভাষা, ব্যাকরণ ও বর্ণমালার প্রচুর সংস্কারের পরামর্শ দেয়া হয়। নতুন ভাষার নামকরণ হয় 'সহজ বাংলা'। কমিটি রোমান বা উর্দু হরফে বাংলা লেখার প্রশ্নকে কমপক্ষে বিশ বছরের জন্য স্থগিত রাখার পরামর্শ দেয়। এ সময়ের মধ্যে উর্দু ভাষাকেও প্রয়োজনীয় সংস্কারের আহ্বান জানায়। এই রিপোর্ট সরকারের খুব ভাল লাগেনি বলেই তা শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্ম

শুরু থেকেই ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তার মধ্য থেকে জন্ম নিতে থাকে অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান সৃষ্টির পর সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ'। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর এটি গঠিত হয়েছিল। সংগঠনের পরিচয় দেয়া হয়েছিল 'পাকিস্তানের তৌহিদী জনতার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান' হিসেবে। সংগঠনটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন, বিতর্ক সভা ও আলোচনা অনুষ্ঠানের নিয়মিত আয়োজন করত। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বে সংগঠনটির ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি।

পাকিস্তান তমুদ্দুন মজলিশ, সংস্কৃতি সংসদ, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের জন্ম

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সংস্কৃতি সংসদ' নামে আরেকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। এই সংগঠনটি ক্রমে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'। সংসদের নিয়মিত পাক্ষিক সাহিত্য সভা বসত। এ সমস্ত সংগঠনের তৎপরতার মধ্য দিয়ে ভাষা প্রশ্নের গুরুত্ব মানুষের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। তারা বুঝতে পারে রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হলে পূর্ববাংলায়

সব ধরনের উন্নতি থেমে যাবে। তমুদ্দুন মজলিশ পুস্তিকা প্রকাশ করে জানিয়ে দেয় পূর্ববাংলার শিক্ষার বাহন, আইন আদালত ও অফিসের ভাষা বাংলা করতে হবে।

এভাবে ভাষা আন্দোলনের একটি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে যায়। যার শক্তির উপর দাঁড়িয়ে রূপ লাভ করে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এবং চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে **১৯৫২** খ্রিস্টাব্দের **২১** ফেব্রুয়ারিতে।

সার-সংক্ষেপ

ভাষা আন্দোলন পূর্ববাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের প্রথম এবং প্রধান ঘটনা। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে **১৯৫২** খ্রিস্টাব্দে এ আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু এর সূত্রপাত হয়েছিল পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই। পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ববাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে শুরু থেকেই। তারা এ দেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলার বদলে উর্দু করতে চায়। আর এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করতে থাকে। এদেশের মানুষের কাছে এই অসৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়ে যায়। ফলে ধীরে ধীরে জন্ম নেয় অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের তৎপরতায় মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তারা প্রতিবাদমুখর হয়ে পড়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. আরবি হরফে বাংলা লেখা চালু করার চেষ্টা নেয়া হয় —
   ক. ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে   খ. ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে   ঘ. ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে

২. রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার পক্ষে প্রথম এগিয়ে আসে —
   ক. সাংস্কৃতিক সংসদ   খ. পাকিস্তান তমুদ্দুন মজলিশ
   গ. পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ   ঘ. বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি

৩. বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য ভাষা কমিটি গঠন করা হয় —
   ক. ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে   খ. ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে   ঘ. ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তান সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছিল।
২. ভাষা সংস্কার কমিটির ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
৩. ভাষা আন্দোলনের পূর্বে গঠিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দিন।

পাঠ ২

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- ভাষা আন্দোলনের সূচনা কিভাবে হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও এর ভূমিকার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ২১শে ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত আন্দোলন সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ভাষা আন্দোলনের সূচনা

মুসলিম লীগের উর্দুভাষী নেতারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই স্বার্থপরের মত আচরণ করেছিলেন। বাংলা ভাষা তাদের কাছে মর্যাদা পায়নি। তখনও দেশ বিভাগ হয়নি। পাকিস্তান নামের নতুন এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা চলছে। যে রাষ্ট্রটি সৃষ্টি হবে পূর্ববাংলা আর পশ্চিম পাকিস্তানকে নিয়ে। অথচ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নেতা চৌধুরী খালেকুজ্জামান হায়দ্রাবাদে এক বক্তৃতায় বলে ফেললেন, ভবিষ্যৎ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। রাষ্ট্রের নয়, একজন নেতার বক্তব্য বলে সেদিন কোন প্রতিবাদ হয়নি। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেখা গেল সরকারও যেন এই মুসলিম লীগ নেতার মতোই ভাবছে। ফলে ক্রমে পূর্ববাংলায় প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়।

পাকিস্তানী শাসকদের নীতির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক যুবলীগের প্রতিবাদ ও তমুদ্দুন মজলিশের 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন

প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা যায় গণতান্ত্রিক যুবলীগের সম্মেলনে। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর। দাবি করা হয় 'পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা হতে হবে বাংলা'। এর আগের পাঠে আপনারা দেখেছেন এ সময়ে একই দাবি নিয়ে তমুদ্দুন মজলিশ তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছিল। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী এসব প্রতিবাদকে তেমন আমল দেয়নি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ নেয়া হয়। এবার প্রতিবাদে ফেটে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। তারা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম বাংলা করার ব্যাপারে চাপ দিতে থাকে। ক্রমে ভাষার প্রশ্ন রাজনৈতিক দাবিতে পরিণত হয়। এবারও এগিয়ে আসে তমুদ্দুন মজলিশ। তারা 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। উল্লেখ্য যে, তমদ্দুন মজলিশের পক্ষ থেকে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। এটি ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা। এতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা দাবী করা হয়। এবার সত্যিই চাপের মুখে পড়ে সরকার। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি পরিষদের সাথে আলোচনার পর শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান আশ্বাস দেন যে, মানি অর্ডার, ফরম, ডাকটিকিট ও মুদ্রায় ইংরেজী-উর্দুর পাশাপাশি বাংলায় লেখা হবে।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন

আরেকবার আলোড়ন ওঠে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি। এ সময় পাকিস্তান গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসেছিল। এখানে পূর্ববাংলা কংগ্রেস দলের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে বাংলাকে স্থান দেয়ার দাবি জানান। কিন্তু এই দাবি মুসলিম লীগের সদস্যরা গ্রাহ্য করেনি। এই সংবাদ ঢাকায় পৌঁছুলে এদেশের ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারেন মাতৃভাষার মর্যাদা রাখতে হলে প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের। এই চিন্তা থেকে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও যুব সংগঠন মিলিতভাবে গঠন করে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য সংগ্রাম পরিষদ'। শুরু হয়ে যায় একের পর এক আন্দোলনের কর্মসূচি।

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন কর্মসূচি

সংগ্রাম পরিষদ ১১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে সফল হরতাল পালন করে। সরকারি নির্যাতন নেমে আসে প্রতিবাদী মানুষের উপর। এতে আন্দোলন থামানো যায়নি। বরং তা আরও ছড়িয়ে পড়ে। ১২-১৫ মার্চ ঢাকাসহ সকল জেলায় ধর্মঘট কর্মসূচি পালিত হয়। বাধ্য হয়ে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন পরিষদের সাথে একটি ৮ দফার চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তিতে বলা হয় সরকারি দমন নীতি প্রত্যাহার করা হবে, তুলে নেয়া হবে ১৪৪ ধারা, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে এবং সংবাদপত্রের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে। শিক্ষার মাধ্যম এবং অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দানের ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় বক্তব্য রাখা হয়।

আন্দোলনকারীদের প্রতি মুহম্মদ আলী জিন্নাহর কঠোর নীতি

কিন্তু এই চুক্তি সাধারণ ছাত্রদের খুশি করতে পারেনি। তারা বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তানি শাসকযন্ত্রকে বিশ্বাস করা যায় না। ফলে আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় আসেন। ২১ মার্চ রেসকোর্সে এক জনসভায় এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। আন্দোলনকারীদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। জিন্নাহর এ ঘোষণা পূর্ব

বাংলার জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ২৪ মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানিয়ে জিন্নাহকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। জিন্নাহর ঢাকা সফরের পর ভাষা আন্দোলনে কিছুটা ভাটা পড়ে।

একুশে ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত আন্দোলন

একুশে ফেব্রুয়ারিতে পুলিশের গুলি এবং ভাষার দাবিতে বাঙালীর অবদান

আন্দোলন ভাটা পড়লেও ছাত্র সমাজ নতুনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে। ইতোমধ্যে খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ব বাংলার প্রধান মন্ত্রীর পদ ছেড়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি কিন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ঢাকা সফরে আসেন। পল্টন ময়দানের জনসভায় তিনিও জিন্নাহ্‌র মতো ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' এবার প্রতিবাদে ফেটে পড়ে ছাত্র জনতা। ৩০ জানুয়ারি ঢাকা শহরে ধর্মঘট পালিত হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ৪ ফেব্রুয়ারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশনের তারিখ ছিল। সেই দিন সংগ্রাম পরিষদ দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়। এবার ভয় পায় সরকার। বাংলার মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন আন্দোলন দমন করার নতুন কৌশল গ্রহণ করে। ২০ তারিখ থেকে পরবর্তী এক মাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। কিন্তু দমে যায়নি ছাত্ররা। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ছাত্র সমাজ সংগঠিত ভাবে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে চেষ্টা করে। ফলে পুলিশের সাথে বেঁধে যায় সংঘর্ষ। বিকেলে ব্যবস্থাপক পরিষদের সভার দিকে প্রতিবাদ মিছিল অগ্রসর হতে গেলে পুলিশ গুলি ছুঁড়ে। মাতৃভাষার দাবি জানাতে গিয়ে শহীদ হন আবুল বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার এবং আহত হন কয়েকজন ছাত্রীসহ অনেকে। এই আত্মদানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের মহান পর্বটি। এই আন্দোলন পূর্ববাংলার জনগণকে নতুনভাবে অধিকার সচেতন ও বিপ্লবী করে তোলে।

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

বাংলা ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রথমত, এটি ছিল বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে সংগঠিত গণ আন্দোলন। এ আন্দোলন পূর্ব বাংলার অধিকার বঞ্চিত মানুষকে অধিকার সচেতন ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদীপ্ত করে। মুসলিম লীগে মুসলিম জাতীয়তাবাদের বদলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম হয়। দ্বিতীয়ত, এছাড়া ভাষা আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটায়। দ্বিজাতি তত্ত্বের ধর্মীয় চেতনার মূলে আঘাত হানে। পাকিস্তান সৃষ্টির সাম্প্রদায়িক ভিত্তি ভেঙ্গে বাঙালিরা অসাম্প্রদায়িক চেতনার আন্দোলন শুরু করে। এর ফলে দীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। তৃতীয়ত, ভাষা আন্দোলনে মুসলিম লীগ জনগনের মানসিকতা ও স্বার্থ উপেক্ষা করে জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে দলটি সোচনীয়ভাবে পরাজয় ঘটে। এর পর আর কোন নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয়ী হয়নি। চতুর্থত, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নিবৃাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ২১ ফেব্রুয়ারি শোক দিবস হিসেবে ছুটি ও শহীদ দিবস ঘোষণা করে। ১৯৫৬ সালের সঙবিধানে বাংলা ভাষা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়। ১৯৬২ সালের সঙবিধানে তা বহাল থাকে। পঞ্চমত, যুক্তফ্রান্ট পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য, ভাষা বৈষম্য তুলে ধরে। যা ষাটের দশকে আওয়ামী লীগের ৬ দফায় পরিস্ফুটিত হয়। স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয় যার প্রেরণা ছিল ভাষা আন্দোলন। ষষ্ঠত, ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর স্বীকৃতি দান আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

ভাষা আন্দোলনের শহীদরা

সার-সংক্ষেপ

বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জনগণের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মাতৃভাষাকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ সময় পূর্ববাংলার ছাত্র সমাজ জীবন বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা করেনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতেই শাসকদের কাছ থেকে পূর্ব বাংলার জনগণ কোন সহানুভূতি পায়নি। তাই তাদেরকে প্রতিবাদ করতে হয়েছে। তারা হয়েছে সংঘবদ্ধ। শেষ পর্যন্ত তাদের চূড়ান্ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। মায়ের ভাষাকে রক্ষা করেছে বুকের রক্ত দিয়ে। এই ঘটনা পূর্ববাংলার জনগণের মনের শক্তিকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অধিকার আদায়ের সব আন্দোলনে একুশের চেতনা সরাসরি ভূমিকা রেখেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বেই উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলেছিলেন —
   ক. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ. খাজা নাজিমউদ্দীন
   গ. শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান ঘ. চৌধুরী খালেকুজ্জামান

২. 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে —
   ক. গণতান্ত্রিক যুবলীগ খ. তমুদ্দুন মজলিশ
   গ. মুসলিম লীগ ঘ. সাংস্কৃতি সংসদ

৩. সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য সংগ্রাম পরিষদের সাথে আট দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেন —
   ক. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ খ. খাজা নাজিমউদ্দীন
   গ. শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান ঘ. চৌধুরী খালেকুজ্জামান

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. ভাষা আন্দোলনের সূচনা কিভাবে হয়েছিল?
২. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও এর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩. ভাষা আন্দোনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য লিখুন।

পাঠ ৩

পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- পাকিস্তানি শাসকরা কিভাবে পূর্ববাংলার সম্পদ শোষণ করার চিন্তা করেছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পূর্ববাংলার প্রতি পাকিস্তানিদের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র কেমন ছিল তার বিবরণ পারবেন।
- শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার জনগণ কতটা বৈষম্যের শিকার হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- পূর্ববাংলার জনগণের প্রতি পাকিস্তানিদের বৈষম্যের প্রতিক্রিয়া কতটুকু সৃষ্টি হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন

পূর্ববাংলার সম্পদ শোষণ করার চিন্তা

পূর্ববাংলার সম্পদ শোষণ করার চিন্তা

প্রথম থেকেই পূর্ববাংলার উপর পাকিস্তানি শাসকবর্গের নীতি ছিল বৈষম্যমূলক। দুই বিচ্ছিন্ন অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হলেও অঞ্চল দু'টি সমান সম্পদশালী ছিল না। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে সমৃদ্ধ ছিল পূর্ববাংলা। অন্যদিকে আয়তনে বড় হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চল ছিল অনুর্বর ও মরুময়। কৃষির দিক থেকে কোন সম্ভাবনা ছিল না সেখানে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই পশ্চিম অঞ্চলে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। আর্থিক দিক থেকে দুর্বল ছিল এ অঞ্চল। অন্যদিকে পূর্ববাংলায় রপ্তানি পণ্য হিসেবে পাট, চা ও চামড়ার যথেষ্ট যোগান ছিল। পূর্ববাংলার প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এ দেশকে সমৃদ্ধ করার কোন চেষ্টা গ্রহণ করেনি। তার বদলে চেয়েছে এ দেশের মানুষকে বঞ্চিত করে এদেশের সম্পদ নিয়ে যেত পশ্চিম পাকিস্তানে।

রাজনৈতিক বৈষম্য

শুরু থেকেই পূর্ব বাংলা রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে পূর্ব বাংলার সংখ্যা গরিষ্ট প্রতিনিধি থাকা সত্বেও গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী উভয়পদেই নিয়োগ দেয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। পূর্ব বাংলার মতামত উপেক্ষা করে পাকিস্তানের রাজধানী করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে। পরে তা ইসলামাবাদে স্থানান্তর করা হয়। পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় নেতাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। এমনকি সংখ্যাধিক্য সত্বেও পূর্ব বাংলাকে সংখ্যা সাম্যনীতি মানতে বাধ্য করা হয়।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র

অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র

যদিও পূর্ববাংলা ছিল সম্পদশালী। তবুও এই সম্পদ এদেশবাসী ভোগ করতে পারত না। পাকিস্তানি শাসকরা তা ছিনিয়ে নিত। পূর্ব পাকিস্তানে রাজস্ব আয় হতো পুরো পাকিস্তানের আয়ের ষাট ভাগ। অথচ এর মাত্র পঁচিশ ভাগ ব্যয় করা হতো আমাদের অঞ্চলে। আর বাকি সব নিয়ে যাওয়া হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানের যা রপ্তানি আয় ছিল তার প্রায় ষাট ভাগ পণ্য যেত পূর্বপাকিস্তান থেকে। কিন্তু আমদানি দ্রব্যের মাত্র ত্রিশ ভাগ দেয়া হতো এ অঞ্চলকে। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ষাট ভাগের বাস ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। কিন্তু জাতীয় আয়ের মাত্র সাতাশ ভাগ ব্যয় করা হতো এ অঞ্চলের জন্য। পূর্ববাংলার সম্পদে পরিপুষ্ট হয়েছে পাকিস্তানের অর্থ ভান্ডার। কিন্তু এ দেশের উন্নয়নের দিকে কোন নজর দেয়া হয়নি।

তাই উর্বর পূর্ববাংলা বার বার বন্যা ও ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। আর মরুময় পশ্চিম পাকিস্তান হয়েছে আমাদের সম্পদে শস্য-শ্যামল। শিল্পের কাঁচামাল পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হলেও বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে তারও মালিকানা থেকে যায় পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে। কৃষি উন্নয়নের জন্য যে ঋণ পাওয়া যেত তার সিংহভাগ কৃষিভিত্তিক অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় না করে ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে।

শিক্ষা ও চাকুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য

শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য

দেখা গেছে সকল ক্ষেত্রেই পূর্ববাংলার প্রতি পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতি ছিল। কৃষি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কেন্দ্রের বেলায় ১৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৩টিই অবস্থিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিভিন্ন বৃত্তির সিংহভাগ সুবিধা পায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা। পূর্ববাংলায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও আনুপাতিক হারে বিদ্যালয় সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বৈষম্যের ফলে ১৯৪৭-৪৮ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববাংলায় যেখানে শিক্ষিতের হার পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি ছিল সেখানে প্রায় বিশ বছরের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষিতের হার পূর্ববাংলার চেয়ে অনেক বেড়ে গেল।

বৈষম্য প্রকটভাবে লক্ষ করা গেল চাকুরি ও নিয়োগের ক্ষেত্রে। খুব সুচিন্তিতভাবেই পূর্ববাংলাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে তারা চাকুরির প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। সিভিল, মিলিটারি ও অন্যান্য চাকরির মূল নিয়োগ দানের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে নিজেদের মত করে নীতি নির্ধারণ করা সহজ হতো। দেখা যাচ্ছে, সামরিক বাহিনীর সকল পর্যায়ের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরির ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের প্রধান দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। অনেক চাকরির বিজ্ঞাপন পূর্ববাংলার সংবাপত্রে দেয়াই হতো না। এ ছাড়াও মনোনয়ন বোর্ডের অধিকাংশ সদস্যই হতেন পশ্চিম পাকিস্তানি। এসব কারণে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের পক্ষে উচ্চ পদে নিয়োগ পাওয়া খুব কঠিন ছিল।

বৈষম্য নীতির প্রতিক্রিয়া

বৈষম্য নীতির প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যের চিত্র প্রকাশিত হয়ে পড়লে পূর্ববাংলার জনগণ স্বাভাবিকভাবেই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে আর একটি দেশও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে একই রাষ্ট্রের এক অঞ্চলের উপর অন্য অঞ্চলের এমন ব্যাপক অর্থনৈতিক শোষণ ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন চলে। যতদিন পর্যন্ত এই বৈষম্যের বিষয়টি পূর্ববাংলার জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়নি ততদিন স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেনি। কিন্তু ক্রমে পাকিস্তানিদের চরিত্র প্রকাশিত হয়ে পড়লে এ অঞ্চলের জনগণ প্রতিবাদমুখর হয়ে পড়ে।

বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে কয়েক পর্যায় প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, প্রথমত, ৫৫% লোকের বাংলা ভাষা উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে ব্যাপক আন্দোলন দেখা যায়। ভাষা আন্দোলন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম বিজয়। দ্বিতীয়ত, ১৯৫৪ সালে বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালিরা ব্যালটের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানায়। শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে মুসলিম লীগ রাজনীতি থেকে চির বিদায় নেয়। তৃতীয়ত ১৯৬২ সালে আইউব খানের সংবিধানের বিরুদ্ধে আইউব বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয় যা শিক্ষা রির্পোটের বিরুদ্ধে আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ক্রমান্বয়ে ছয় দফা ভিত্তিক, আগরতলা মামলা বিরোধী সর্বোপরি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইউব খানের পতনের মাধ্যমে বৈষম্য বিরোধী প্রতিক্রিয়া সফল হয়। চতুর্থত, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে বাঙালির রায়

ছিল বৈষম্যের বিরুদ্ধে সফল প্রতিবাদ। যদিও বাঙালি জাতিকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় বাঙালি রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে।

সার-সংক্ষেপ

পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে অভিন্ন দেশ পাকিস্তানের সৃষ্টি হলেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের কাছ থেকে পূর্ববাংলা সমান দৃষ্টি ও সহানুভূতি পায়নি। তার বদলে সম্পদশালী পূর্ববাংলাকে শোষণ করে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে ফেলা হয়। শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাকুরি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হয় পূর্ববাংলা। অবশেষে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় পাকিস্তানি শাসকচক্রের শোষকের চেহারা। তারা ক্রমে আন্দোলনমুখর হয়ে পড়ে অধিকার আদায়ের জন্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. পূর্ববাংলার জন্য পাকিস্তানের মোট জাতীয় আয় থেকে ব্যয় করা হতো —
   ক. ষাট ভাগ খ. সাতাশ ভাগ
   গ. পঁচিশ ভাগ ঘ. পনেরো ভাগ

২. ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ববাংলায় শিক্ষিতের হার পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে —
   ক. কম ছিল খ. সমান ছিল
   গ. কাছাকাছি ছিল ঘ. বেশি ছিল

৩. পাকিস্তানি আমলে বাঙালিদের উচ্চপদে নিয়োগ পাওয়া -
   ক. সহজ ছিল খ. স্বাভাবিক ছিল
   গ. কঠিন ছিল ঘ. একটি সাধারণ বিষয় ছিল

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ববাংলার সম্পদ শোষণের চিন্তা কিভাবে করেছিল?
২. পূর্ববাংলার প্রতি পাকিস্তানি শাসকগণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কেমন বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল?

পাঠ ৪

যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- কি ভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচন, নির্বাচনের ফলাফল ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন।

যুক্তফ্রন্ট গঠন

ইতোমধ্যে মুসলিম লীগের শাসনের প্রতি পূর্ববাংলার জনসাধারণের আর কোন আস্থা ছিল না। তাদের অধিকারের প্রতি মুসলিম লীগ কোন সম্মান দেখায়নি। পূর্ববাংলায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও মুসলিম লীগ সরকার বার বার তারিখ পেছাতে থাকে। অবশেষে

বিক্ষুব্ধ মানুষের চাপের মুখে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। এদেশের বিভিন্ন দলের রাজনীতিবিদগণ বুঝতে পারেন ক্ষমতাসীন সরকারী দল মুসলিম লীগের সাথে নির্বাচনে জয়লাভ করা কঠিন হবে। ইতিমধ্যেই ১৯৪৯ সালে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিকে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক 'কৃষক শ্রমিক পার্টি' (কে.এস.পি.) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন। কিন্তু ছাত্র ও প্রগতিশীল রাজনীতিবিদরা চেয়েছেন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সকলের ঐক্য। অবশেষে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির প্রচেষ্টায় হাজী দানেশের নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর আওয়ামী মুসলিম লীগ, কে.এস.পি. এবং নেজামে ইসলামী দলের সমন্বয়ে গঠিত হয় মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা এবং তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল ২১ দফা।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে মোকাবেলা করার জন্য যুক্তফ্রন্ট গঠন

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা

যুক্তফ্রন্ট তাদের ঐতিহাসিক ২১ দফা দাবিতে গণমানুষের অধিকারের কথা তুলে ধরে। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা ছিল নিম্নরূপ

১. বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা
২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ করা
৩. পাটের ব্যবসা জাতীয়করণ করা
৪. সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা
৫. পূর্ব পাকিস্তানে লবণ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা
৬. কারিগর মুহাজিরদের কাজের ব্যবস্থা করা
৭. বন্যা ও দুর্ভিক্ষ রোধের জন্য খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করা
৮. পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প কারখানা গড়ে তোলা
৯. অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা
১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা
১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা
১২. শাসন ব্যয় হ্রাস করা ও মন্ত্রীদের বেতন এক হাজার টাকার বেশি না করা
১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা
১৪. জন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি বাতিল করা
১৫. বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথকীকরণ করা
১৬. বাংলা ভাষা গবেষণার জন্য বর্ধমান হাউজে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা
১৭. রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবিতে নিহত শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে মিনার নির্মাণ করা
১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করা
১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা
২০. আইন পরিষদের মেয়াদ কোনভাবেই বৃদ্ধি না করা
২১. পরিষদের কোন সদস্য পদ খালি হলে তিন মাসের মধ্যে উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা করা

একুশ দফায় ছিল গণমানুষের অধিকারের কথা

২১ দফা ছিল আসলে পূর্ববাংলার মানুষের অধিকারের দলিল। সুতরাং এই ২১ দফা ইশ্‌তেহার দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচন, ফলাফল ও তাৎপর্য

প্রধানত স্বায়ত্তশাসনের দাবিতেই এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট। পূর্ববাংলার আইন পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯টি। এর ২৩৬ টি আসনই যুক্তফ্রন্ট পেয়ে যায়। মুসলিম লীগ পায় ৯টি, কংগ্রেস ২৪টি, তফসিলী সম্প্রদায় পায় ২৭টি, খেলাফত রাব্বানী পার্টি ১টি, খ্রিস্টান ১টি, বৌদ্ধ ২টি, কম্যুনিস্ট পার্টি ৪টি এবং নির্দলীয় সদস্যরা ৫টি আসন লাভ করে।

নির্বাচনের ফলাফল

নির্বাচনে মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনসহ মুসলিম লীগের বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা পরাজিত হন। মূলত মুসলিম লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতা, রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তাদের অবস্থান, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা, পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক দুর্গতি ও নেতৃত্বের জনবিচ্ছিন্নতাই মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রথম অবাধ নির্বাচন। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় এ অঞ্চলের মানুষের মনে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তাদের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জোরদার হয়।

বিভিন্ন দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হওয়ায় এই দলের ভেতর স্বাভাবিকভাবেই ভিন্নমতের নেতাদের উপস্থিতি ছিল। নির্বাচনে জয়লাভ করলেও যুক্তফ্রন্টের এই দুর্বলতা থেকে গিয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের প্রধান নেতা ছিলেন ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী ও শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। তাঁদের মধ্যে নির্বাচনের পর পরই অনেক ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিতে থাকে। যুক্তফ্রন্টের এই দুর্বলতার বিষয়টি মুসলিম লীগের চোখে তেমন একটা ধরা পড়েনি। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে তারা খুব ভীত হয়ে পড়ে। এবার সুযোগ খুঁজতে থাকে কিভাবে এই বিজয়ের ফলাফলকে বানচাল করা যায়।

মন্ত্রিসভা গঠন

মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব অনুমোদন

নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হল। এ কে ফজলুল হক হলেন মুখ্যমন্ত্রী। শেরেবাংলা এবং যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ব্যাপারে চেষ্টা চালাতে থাকেন। এই মন্ত্রিসভা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং বর্ধমান হাউজকে বাংলা একাডেমী করার প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার অবসান

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল ফজলুল হক আমন্ত্রিত হয়ে কলিকাতা গিয়েছিলেন। সেখানে বক্তৃতা দেয়ার সময় তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে দুই বাংলা যে অভিন্ন তা বর্ণনা করেন। এবার মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা সুযোগ খুঁজে পেলেন। তারা দেখতে পেলেন এই বক্তৃতার রেশ ধরে ফজলুল হককে অপসারণ করা যেতে পারে। তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। প্রচার করা হয় ফজলুল হক ভারতের কাছে পূর্ববাংলা বিক্রি করে দিতে চান। একই সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো হতে থাকে। আর সব দায় দেয়া হতে থাকে যুক্তফ্রন্ট

সরকারের উপর। অবশেষে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে ভেঙ্গে দেয়া হয়। পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারী করেন। তৎকালনি প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন বলবৎ ছিল।

সার-সংক্ষেপ

পাকিস্তানি শাসক চক্রের বৈষম্যের শিকার হয়ে যখন পূর্ববাংলার জনগণ মুসলিম লীগের উপর আর আস্থা রাখতে পারছিল না তখনই ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। এ সময় পূর্ববাংলার রাজনীতিবিদগণ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন। তারা মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়। এভাবেই গঠিত হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল বিজয় অর্জন করে। এই সুবাদে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা। কিন্তু মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় সরকার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তারই ফল হিসেবে অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে অল্পদিনের মাথায়ই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়। পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করা হয় এবং ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তা বলবৎ থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. প্রাদেশিক নির্বাচনের তারিখ ঠিক করা হয়েছিল —
   ক. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে খ. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল
   গ. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে ঘ. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন

২. নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে —
   ক. ৩০৯টি আসন খ. ২৩৬টি আসন
   গ. ২৭টি আসন ঘ. ১৩৬টি আসন

৩. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া হয় —
   ক. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে খ. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর
   গ. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল ঘ. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. কিভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল?
২. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের ফলাফল কি হয়েছিল?
৩. কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়

পাঠ ৫

পাকিস্তানের রাজনীতি (১৯৫৬-১৯৬৫ খ্রিঃ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান জারি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।
- আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও তাঁর কার্যবলীর বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পর্যন্ত পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৯৫৬ সালের সংবিধান

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান ঘোষণা করা হয়। এ সংবিধানের মাধ্যমে 'পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র' নাম ধারণ করে। পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলোকে একত্রিত করে এক ইউনিট গঠন করা হয় এবং নাম করণ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব বাংলার নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। সংবিধানে সকল বিষয়ে সংখ্যাসাম্য নীতি স্বীকৃত হয়। বাংলা এবং উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেয়া হয়।

প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ

গোলাম মুহাম্মদের পদত্যাগের পর ইস্কান্দর মির্জা পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। তাঁর অগণতান্ত্রিক আচারণ ও হস্তক্ষেপের ফলে ১৯৫৬-৫৮ সালের মধ্যে কেন্দ্রে তিনটি মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানেও রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের মধ্যে গোলযোগে পরিষদ কক্ষেই ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী আহত হন এবং পরদিন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর ঘটনাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে প্রেসিডেন্ট মির্জা গণতান্ত্রিক শাসন অবসানের উদ্যোগ নেন।

সামরিক শাসন জারি ও আইয়ূব খানের ক্ষমতা দখল

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রেসিডেন্ট মির্জা দেশে সামরিক শাসন জারী করেন। সেনাপ্রধান আইয়ূব খানকে প্রধান সামরিক শাসক নিযুক্ত করেন। সংবিধান বাতিল, আইন পরিষদ ও মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়। সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। প্রেসিডেন্ট মির্জার গণতন্ত্র বিরোধী উপরোক্ত কার্যক্রমে প্রধান সহযোগী ছিলেন আইয়ূব খান। উচ্চ বিলাসী আইয়ূব খান সামরিক শাসন যাত্রার ২১ দিনের মাথায় ইস্কান্দর মির্জাকে পদচ্যুত করে নিজে প্রেসিডেন্ট পদ দখল করেন।

রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর বিধিনিষেদ

ক্ষমতাদখলের পর আইয়ুব খান কঠোর হস্তে দুর্নীতি দমন ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রন করেন। অতঃপর তিনি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ১৯৫৯ সালে 'পোডো' (PODO) এবং 'এবডো' (EBDO) নামক দুটি আদেশ জারী করে রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ ও নির্বাচনে রাজনীতিবিদদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেন।

মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন

১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে আইয়ূব খান 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করেন। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাকিস্তানের দুই অঞ্চল থেকে ৪০ হাজার করে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্য নির্বাচন করা হয়। আইয়ূব খান ৫ স্তর বিশিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। তাঁর প্রশাসনিক কাঠামোর সর্ব নিম্নস্তর ছিল ইউনিয়ন কাউন্সিল। মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্যরা ছিলেন ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য। এরাই জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচনে ভোট দানের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ১৯৬০ সালে এসব মৌলিক গণতন্ত্রীর আস্থা ভোটে আইয়ূব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

পশ্চিম পাকিস্তানিদের পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিমাতাসূলভ আচরণ ও বৈষম্য পূর্ব-পাকিস্তানে অসন্তোষ বৃদ্ধি করে। ১৯৬১ সালের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। গণতন্ত পূনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলন দমনে আইয়ুব সরকার গ্রেপ্তার নির্যাতন চালালে ছাত্র গণআন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এ অবস্থায় আইয়ূব খান ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে একটি সংবিধান ঘোষণা করেন। সংবিধানে কেন্দ্র ও প্রদেশের মন্ত্রীসভা ও গভর্ণরের ক্ষমতা সংকুচিত করা হয়। প্রেসিডেন্টের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত করা হয়। বিচার বিভাগের ক্ষমতাও খর্ব করা হয়।

আইয়ূব বিরোধী আন্দোলন ও ১৯৬২ সালের সংবিধান

আইয়ূব খান ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচন বর্জন করে। ফলে আইয়ূব সমর্থক ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ সহজেই নির্বাচনে জয় লাভ করেন। ১৯৬২ সালের ৮ জুন আইয়ুব খান সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন।

জাতীয় পরিষদ নির্বাচন ও সামরিক শাসন প্রত্যাহার

পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত হামদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কমিশন রিপোর্ট বাতিল এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবীতে ১৯৬২ সালে ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়। এ অবস্থায় আইয়ূব খান 'রাজনৈতিক দলবিধি' প্রবর্তন করে পাকিস্তানে রাজনৈতিক দলের পূনরুজ্জীবন ঘটান। প্রেসিডেন্ট নিজে 'কনভেশন মুসলিম লীগ' নামে একটি দল গঠন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামী দল সক্রিয় হয়। এ সময় সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' (এন.ডি.এফ) নামে একটি রাজনৈতিক মোর্চা গঠন করেন। ১৯৬৪ সালে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের পূনরুজ্জীবন ও পূনর্গঠন করেন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী গণ আন্দোলন পরিচালিত হয়।

রাজনৈতিক দলের পূনরুজ্জীবন

১৯৬৪ সালে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনের ঘোষণা দেন। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন 'কাউন্সিল মুসলিম লীগ'কে মোকাবিলা করার জন্য ৫টি বিরোধী দল একত্রিত হয়ে 'সম্মিলিত বিরোধী দল' (COP) নামে একটি জোট গঠন করে। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কপের প্রার্থী হিসেবে ফাতেমা জিন্নাহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তবে কায়েমী স্বার্থন্ধ মৌলিক গণতন্ত্রীদের নিরঙ্কুশ সমর্থনে আইয়ুব খান ফাতেমা জিন্নাহকে সহজেই পরাজিত করতে সক্ষম হন। তিনি দ্বিতীয় বারের মত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় এবং মে মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ফলাফলও সরকারী দলের পক্ষে যায়। অবৈধ প্রভাব ও প্রশাসনিক যন্ত্রকে ব্যবহার করেই আইয়ূব খান নির্বাচনে জয় নিশ্চিত করেন। ফলে ১৯৬৫ সালের নির্বাচন পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন

কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। ৬ সেপ্টেম্বর ভারত লাহোর আক্রমণে অগ্রসর হয়। পাকিস্তানি সৈনিকদের তীব্র প্রতিরোধ, বাঙালি সৈন্যদের অসম সাহসিকতা ও নৈপুন্যে ভারতের লাহোর দখলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৭ দিন যুদ্ধের পর জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ২৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হয়। ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারী স্বাক্ষরিত 'তাসখন্দ চুক্তি'র মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।

পাক-ভারত যুদ্ধ ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া

পাক-ভারত যুদ্ধ ও তাসখন্দ চুক্তি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে। আইয়ূব খানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। এ যুদ্ধের সময় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক অসহায়ত্বের প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের অরক্ষিত

অবস্থা এবং তদুপরি যুদ্ধজনিত কারণে অর্থনীতিতে অহেতুক চাপ পূর্ব পাকিস্তানিদের আইয়ূব বিরোধী মনোভাবকে চাঙ্গা করে। যুদ্ধের পর পরই পূর্ব পাকিস্তানের দাবী দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন।

সার-সংক্ষেপ

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচিত হয়। পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জার গণতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারী করা হয়। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আইয়ূব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জাকে পদচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর অগণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক ছাত্র গণ আন্দোলনের সূচনা করে। নানা রকম কুটকৌশল ও দমন নীপিড়ন সত্ত্বেও আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়। ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলনের মাধ্যমে তা আইয়ূবের শাসন ভিত্তিকে প্রকম্পিত করে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. পূর্ব বাংলার 'পূর্ব পাকিস্তান' নামকরণ করা হয় —
   ক. ১৯৪৭ সালে খ. ১৯৫০ সালে
   গ. ১৯৫৪ সালে ঘ. ১৯৫৬ সালে

২. মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন —
   ক. ইস্কান্দর মির্জা খ. মাওলানা ভাষানী
   গ. আইয়ূব খান ঘ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

৩. পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান রচিত হয় —
   ক. ১৯৫৬ সালে খ. ১৯৫৮ সালে
   গ. ১৯৬০ সালে ঘ. ১৯৬২ সালে

৪. ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে 'কপ' এর প্রার্থী ছিলেন —
   ক. আজম খান খ. ফাতেমা জিন্নাহ
   গ. হোসেন শহীদ সোহরাওর্দী ঘ. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাষানী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. মৌলিক গণতন্ত্র বলতে কি বুঝেন?
২. ১৯৬২ সালের সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য লিখুন
৩. ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কে পূব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করুন।

পাঠ ৬

ছয় দফা ও এগার দফা আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- ছয় দফা দাবি কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ছয় দফা উত্থাপন করার পর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- এগার দফা আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

ছয় দফা ঘোষণা

ছয় দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির সনদ

আপনারা পাঠ-৩ এ পূর্ববাংলার প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক নীতির কথা জেনেছেন। তাদের কাছে বৈষম্যের বিষয়টি যখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন চারদিকে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। এর প্রতিকার পেতে চায় পূর্ববাংলার জনগণ। এ সময়ের রাজনৈতিক নেতারা বুঝতে পারেন পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন ছাড়া অধিকার রক্ষার আর কোন পথ নেই। ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে সবচেয়ে জনপ্রিয় দল ছিল আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মজিবুর রহমান এ সময় এগিয়ে এলেন পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির সনদ নিয়ে। এই সনদটি ছিল ঐতিহাসিক ছয় দফা।

লাহোরে আয়ুব খান বিরোধী দলগুলির একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি। এই সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ছয় দফা পেশ করতে ব্যর্থ হয়ে লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বিস্তারিতভাবে ছয়দফা পেশ করেন। ছয়দফাতে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক দাবী। ছয় দফা কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ—

ছয় দফার কর্মসূচি সমূহ

১. পাকিস্তানের জন্য একটি সত্যিকার অর্থে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে। এর ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব এবং সরকার হবে সংসদীয় পদ্ধতির। প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আইনসভাগুলো হবে সার্বভৌম।

২. শুধুমাত্র দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয় থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। অবশিষ্ট ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে।

৩. দেশের দুই অংশে সহজেই বিনিময়যোগ্য অথচ পৃথক দুটো মুদ্রা থাকবে। অথবা ফেডারেল ব্যাংকের অধীনে দুই দেশের দুটি রিজার্ভ ব্যাংক ব্যবস্থাসহ একই ধরনের মুদ্রা চালু থাকবে।

৪. আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে সকল প্রকার কর ধার্য করার ও আদায়ের ক্ষমতা। আদায়কৃত রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়া হবে।

৫. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রার আলাদা আলাদা হিসেব থাকবে। প্রয়োজনে দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে অথবা সংবিধানে নির্ধারিত হারে কেন্দ্র বৈদেশিক মুদ্রা পাবে।

৬. অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক সেনাবাহিনী অর্থাৎ মিলিশিয়া ও প্যারা মিলিশিয়া গঠন করতে পারবে।

ছয় দফার প্রতিক্রিয়া

ছয় দফার আন্দোলন থামাতে সরকারের দমন নীতি

ছয় দফা ঘোষিত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানিদের মনে নতুন আশার আলো দেখা দিল। তাই দিন দিন ছয় দফার কর্মসূচি জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। এই জনপ্রিয়তা সরকারকে প্রচন্ড ভয় পাইয়ে দেয়। এবার তারা সতর্ক হয় এবং প্রচার করতে থাকে যে, ছয় দফা হচ্ছে রাষ্ট্র বিরোধী আন্দোলন। অপব্যাখ্যা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি পাকিস্তানি শাসক চক্র। তারা এই আন্দোলন

প্রতিহত করার জন্য দমন নীতি প্রয়োগ করতে থাকে। রাজনৈতিক নেতাদের উপর শুরু হয় হয়রানি ও নির্যাতন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ মে শেখ মুজিবসহ অনেক আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। এতে আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে প্রতিবাদী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ। আওয়ামী লীগ পালন করে প্রতিবাদ দিবস। নেতাদের মুক্তির দাবিতে ৭ জুন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতালের ডাক দেয়া হয়। সরকারের ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে প্রতিবাদী মানুষ মিছিল বের করে। এই দিন পুলিশের গুলিতে কিশোর মতিউরসহ ১১ জন নিহত এবং বহুসংখ্যক লোক আহত হয়।

ছয় দফার গুরুত্ব

ছয়দফার প্রতিটি দফাই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ এবং এ কারণে একে বাঙালির বাঁচার দাবি বলা হয়েছে।

১. বাঙালি জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ : ছয় দফার প্রতি জনগণের সমর্থন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ছয় দফা আন্দোলন কঠোরভাবে দমনের ফলে বাঙালি জাতি নবযাগ্রত চেতনাবোধ তাদের ঐক্যবদ্ধ করে। এর ফলে স্বায়ত্ত শাসন দাবি জোরদার হয়।

২. আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি : ছয় দফা ভিত্তিক দাবিগুলো ছিল বাঙালির প্রাণের দাবি, তাই এদলটি '৬৬ সালের পর ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

৩. ১৯৭৫ সালের নির্বাচনে প্রভাব : ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী কর্মসূচিতে ছয় দফা অন্তর্ভূক্ত করায় এদলটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে।

৪. মুক্তিযুদ্ধে প্রভাব : ছয় দফাকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ অংকুরিত হয়। ৭০ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে বাঙালির স্বাশাসনের নিষয়টি সময়ের ব্যাপারে পরিণত হয়। এভাবে ছয় দফা বাঙালি জাতিকে মুক্তির প্রেরণা দেয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা

ছয় দফার আন্দোলনকে থামিয়ে দেয়ার জন্য সরকার এবার নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে সরকার পক্ষ থেকে একটি মামলা করা হয়। প্রধান আসামী করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে। এটি ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা। শেখ মুজিব তখন জেলখানায় বন্দী। সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে আরও ৩৫ জনকে এই মামলার আসামী করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় এই বলে যে, আসামীগণ ভারতের যোগসাজশে পূর্বপাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। অভিযোগে আরও বলা হয় যে, আসামীগণ ত্রিপুরা প্রদেশের আগরতলায় বসে এই ষড়যন্ত্র করেছিল। এ কারণে মামলাটির নাম হয় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।'

সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা

এই মামলা জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। প্রতিবাদী মানুষ আসামীদের মুক্তি এবং মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিতে থাকে। অচিরেই এই আন্দোলন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে রূপ লাভ করে। একটি ঘটনা আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তোলে। ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে কর্তব্যরত অবস্থায় বিনা কারনে হত্যা করে। এ ঘটনা দ্রুত পরিস্থিতি অশান্ত করে তোলে। ২১ ফেব্রুয়ারি আইউব খান তাঁর পদত্যাগের ঘোষণা দেন এবং ২৫ মার্চ পদত্যাগ করেন। মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে ঢাকা সেনানিবাসে বন্দি অবস্থায় পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছিল। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং মাওলানা ভাসানী এই আন্দোলনের নেতৃত্বে দেন। অবশেষে আন্দোলনের চাপে দিশেহারা সরকার বাধ্য হয় মামলাটি তুলে নিতে।

এগার দফা আন্দোলন

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মধ্য দিয়ে সামরিক শাসন ও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন যখন তীব্র হচ্ছিল তখন নেতৃত্বের পুরো ভাগে চলে আসে ছাত্ররা। এ সময়ে ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহ্মেদের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। এই পরিষদ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এগার দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগার দফা কর্মসূচির ভেতর ছয় দফাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল শিক্ষা সংক্রান্ত বেশ কিছু দাবি। এগার দফা কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স বাতিলের কথা বলা হয়। তাছাড়াও শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের স্বাধীনতা, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, কৃষক ও শ্রমিকের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ, নিরাপত্তা আইন ও জরুরী আইন প্রত্যাহার এবং রাজবন্দিদের মুক্তি প্রভৃতি দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এভাবে ক্রমে ছয় দফা ও এগার দফার মধ্য দিয়ে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিতে থাকে।

সার-সংক্ষেপ

পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এ সময় এগিয়ে আসেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মজিবুর রহমান। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির সনদ হিসেবে পরিচিত ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। এই দাবি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করলে পাকিস্তানি শাসকবর্গ ভীত হয়ে পড়ে। তারা আন্দোলনকারীদের উপর অত্যাচার চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে শেখ মুজিবসহ অনেক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু এই দমন নীতি তাদেরকে আরও প্রতিবাদী করে তোলে। অবশেষে আন্দোলনের মুখে সরকার প্রত্যাহার করে মামলা। তবে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন এতে থেমে যায়নি। 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে ছাত্ররা আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে আসে। ছাত্ররা উত্থাপন করে এগার দফা দাবি। ছয় দফা ও এগার দফা আন্দোলন ক্রমে গণ আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. ছয় দফা দাবি প্রথম উত্থাপন করা হয় —

ক. ঢাকায় খ. লাহোরে

গ. আগরতলায় ঘ. ইসলামাবাদে

২. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় —

ক. ১৯৬৬ খিস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি খ. ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ মে

গ. ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে ঘ. ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চে

৩. সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন —

ক. তোফায়েল আহ্মেদ খ. শেখ মুজিবুর রহমান

গ. সার্জেন্ট জহুরুল হক ঘ. কিশোর মতিউর

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. ছয় দফা দাবি কি?

২. ছয় দফার প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

৩. এগার দফা আন্দোলনের বর্ণনা দিন।

পাঠ ৭

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের গণ আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- ’৬৯ এর গণ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট কি ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- গণ অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ ঘটনাসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন।
- ’৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৯৬৯ এর গণ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

আইয়ুব খানের উন্নয়নের দশক পালনের আয়োজন ও এর প্রতিক্রিয়া

পূর্ববর্তী পাঠগুলো থেকে এ বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন যে, পাকিস্তানি শাসকদের প্রতি আর কোন আস্থা ছিল না পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়েও আন্দোলন থামাতে পারেননি আইয়ুব খান। এর মধ্যে ১৯৬৮ সালের একটি ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। এ সময় আইয়ুব খান তাঁর শাসনকালের ‘উন্নয়ন দশক’ (১৯৫৮-১৯৬৮) পালনের আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের নিকট আইয়ুবের শাসন ছিল শোষণ বঞ্চনা আর নির্যাতনের দশক। এদেশবাসী আইয়ুবের শাসনকে দেখেছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার যুগ হিসেবে। সুতরাং এই উন্নয়নের দশক পালন মানুষকে ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এর আগে ছয় দফা ও এগার দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এদেশবাসী অনেক বেশি গণতন্ত্রমুখী হয়ে পড়েছিল। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগের কিছু নেতৃবৃন্দকে জেল থেকে ছেড়ে দেয়ায় আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পায় এবং আন্দোলন আরও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই সময় পূর্বপাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মিলিত ভাবে একটি ‘কমিটি অব অ্যাক্‌শন’ গঠন করে। এতে অংশ নেয় সংগ্রামরত অন্যান্য সংগঠন। সরকার ২০ জানুয়ারি রাতে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। ‘কমিটি অব অ্যাক্‌শন’ ঠিক করে তারা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গবে।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান

কমিটি অব অ্যাকশন গঠন

গণ অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ ঘটনা

পুলিশের গুলিতে আসাদের মৃত্যু

২০ জানুয়ারি হাজার হাজার ছাত্র জনতা পুলিশ ও ই.পি.আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স) -এর মুখোমুখি হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সাথে পুলিশ টিকতে না পেরে পিছু হটতে থাকে। ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে মিছিল এগিয়ে চলে শহীদ মিনারের দিকে। এবার পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বামপন্থী ছাত্র নেতা আসাদুজ্জামান আসাদ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সেন্ট্রাল ল কলেজের আইনের ছাত্র ছিলেন। ২১ জানুয়ারি আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে বহু লোক রাস্তায় নেমে পড়ে। কোন ভয় তাদের গতি রোধ করতে পারেনি। ২১ তারিখে দেশব্যাপী পালিত হয় সাধারণ হরতাল। ২২, ২৩ ও ২৪ তারিখে শোক দিবস পালনের

ঘোষণা দেয়া হয়। ২৪ তারিখে পুলিশ ছাত্রদের মিছিলে বাধার সৃষ্টি করে। বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত রাস্তায় নেমে এসেছিল ছাত্র জনতা। পুলিশের বাধা পেয়ে মিছিল আরও দুর্বার রূপ নেয়। মিছিলকারীরা সেক্রেটারিয়েট ভবন আক্রমণ করে এবং একাংশে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঢাকা নগরী বিপ্লবী মিছিলকারীদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এবার মিছিল সরকারী পত্রিকা 'দৈনিক পাকিস্তান' ও সরকার সমর্থক 'দৈনিক মর্নিং নিউজ' অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতদিন আন্দোলন ছিল ছাত্র ও আইনজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ২৪ তারিখে তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। মিছিলে যোগ দেয় রিক্শা ও মোটর যানের চালক আর শ্রমিক সম্প্রদায়।

পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রনহীন

আন্দোলন যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে তখন পুলিশকে সাহায্য করার জন্য শহরে ই.পি.আর নামানো হয়। ই.পি.আর বিভিন্ন স্থানে গুলি চালায়। এতে আন্দোলন না থেমে আরও বেগবান হয়। মিছিলে যোগ দিতে থাকে অধিকহারে যুবক ও সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ।

পূর্ববর্তী পাঠে আপনারা জেনেছেন, সার্জেন্ট জহুরুল হক'কে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। এই ঘটনা আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে। পরদিন সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় পল্টন ময়দানে। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে তাঁর জানাজায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটে। জানাজার পর বিশাল মিছিল তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়ে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ট্রাইবুনাল কমিটির চেয়ারম্যান বিচারপতি এ.এস.এম. রহমানের বাসভবনের দিকে ধাওয়া করে আসে মিছিল। বিচারপতি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। পুড়িয়ে দেয়া হয় বাড়ীটি।

গণ আন্দোলন আইয়ুব খানের ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে দেয়

এর মধ্যে খবর আসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ শামসুজ্জোহাকে সৈন্যরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এই খবর আন্দোলনকে আরও উত্তাল করে তোলে। এবার পুলিশ ও সৈন্যদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালাতে থাকে জনতা। ভেঙ্গে পড়ে শাসন ব্যবস্থা। সেক্রেটারিয়েট বন্ধ হয়ে যায়। এইভাবে আন্দোলন আইয়ুব খানের ক্ষমতার ভিতকে কাঁপিয়ে তুলে। ২২ ফেব্রুয়ারী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবসহ রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়া হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদের প্রস্তাব অনুযায়ী শেখ মুজিবকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সভায় বঙ্গবন্ধু ছয় দফা ও এগার দফা দাবি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন।

১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া

গোল টেবিল বৈঠকে ছয় দফা ও এগার দফার ভিত্তিতে শেখ মুজিবের স্বায়ত্বশাসন দাবি

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিব সহ নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেয়া ছাড়াও আইয়ুব খান পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে রাজনৈতিক নেতাদের এক গোল টেবিল বৈঠক ডাকেন। এই বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় ছয় দফা ও এগার দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলেন। কিন্তু এই দাবিকে অগ্রাহ্য করা হয়। ফলে শেখ মুজিবুর রহমান বৈঠক বর্জন করেন। এভাবে আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়। সেই সাথে আইয়ুব খানের ক্ষমতা ধরে রাখার শেষ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। তিনি ২১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের

আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান

গভর্ণর মোনেম খানকে সরিয়ে দিয়ে নতুন গভর্নর নিযুক্ত করেন ডঃ এম.এন. হুদাকে। কিন্তু তাতেও সমস্যা মেটেনি। শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান প্রধান সেনাপতি আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা ছেড়ে দেন। এইভাবে গণ আন্দোলনের মুখে পতন ঘটে আইয়ুব খানের। '৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানই পরবর্তীকালে পূর্বপাকিস্তানকে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে এগিয়ে নেয়।

গণ অভুত্থানের গুরুত্ব

বাংলাদেশের ইতিহাসে গণ অভ্যুত্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ ও প্রতিবাদের সৃষ্টি হয় এবং সাফল্যজনক পরিণতি আইউব খানের পতন। এ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সংসদীয় সরকার ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বীকৃতি মিলে। স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বাঙালির যে জাতীযতাবোধ ১৯৪৮ সালে সৃষ্টি হয় তা পূর্ণতা পায় ঊনসত্তর সালের। ১৯৬৯ এর গণঅভুত্থান জাতীয় চেতনার প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ৫৮ সালের সামরিক শাসনের সময় এ ছুটি বাতিল হতে দিন। ১৯৭০ সালের আওয়ামী লীগের বিজয়ের পেছনে '৬৯ এর গণ অভুত্থানের ভূমিকা রয়েছে।

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৬৯-এর গণ আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আইয়ুব খানের দমন নীতি, শোষণ নিপিড়ন, নির্যাতন পূর্ব পাকিস্তানিদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত গণরোষ বিপ্লবী করে তোলে প্রতিবাদী মানুষকে। মানুষের মিছিলের জোয়ারে ঢাকার রাজপথ উত্তাল হয়ে উঠে। আন্দোলনে শরীক হয় সমগ্র পূর্বপাকিস্তান। পুলিশ আর সৈন্যরা গুলি চালিয়েও থামাতে পারেনি আন্দোলন। আন্দোলনের মুখে ভেঙ্গে পড়ে সরকারী প্রশাসন। গণ আন্দোলন গণ অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত গণ অভ্যুত্থানের মুখে টিকতে না পেরে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন আইয়ুব খান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. আইয়ুব খান 'উন্নয়নের দশক' পালন করেন —
   - ক. ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে
   - খ. ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে
   - গ. ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে
   - ঘ. ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে

২. পুলিশের গুলিতে আসাদ নিহত হন —
   - ক. ২৩ জানুয়ারি
   - খ. ২১ জানুয়ারি
   - গ. ২৪ জানুয়ারি
   - ঘ. ২০ জানুয়ারি

৩. আইয়ুব খান ক্ষমতা ছেড়ে দেন —
   - ক. মোনেম খানের কাছে
   - খ. ড. এম.এন হুদার কাছে
   - গ. আগা মোহম্মদ ইয়াহিয়া খানের কাছে
   - ঘ. ড. শামসুজ্জোহার কাছে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।
২. গণ আন্দোলনের ঘটনারসমূহের বিবরণ দিন।
৩. গণঅভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করুন।
৪. গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

পাঠ ৮

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট কি ছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- পাকিস্তানি শাসক ও ভূট্টোর ভূমিকা কি ছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনা করে বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা

ক্ষমতা হস্তান্তরের পাকিস্তানি নেতাদের ষড়যন্ত্র

গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আপনারা জেনেছেন কিভাবে আইয়ুব খানের পতন ঘটেছিল। গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে বিজয় অর্জিত হয়েছিল তা পূর্ব পাকিস্তানিদের অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ রাতে ক্ষমতায় বসে সামরিক শাসন জারী করেছিলেন। শুরুতেই তিনি ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল ও জাতীয় পরিষদ বিলুপ্ত করেন। দেশে সব রকম রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

জুলফিকার আলী ভূট্টো

শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলোর দাবির প্রেক্ষিতে ইয়াহিয়া খান ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদ ও ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। কিন্তু বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে যায়। পুনরায় তারিখ ঘোষণা করা হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু এবারও বাধা আসে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসে প্রায় ১০/১৫ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। কিন্তু এরপরও নির্বাচনের তারিখ অপরিবর্তিত থাকে। শুধু উপকূলীয় অঞ্চলের জাতীয় পরিষদের ৯টি ও প্রাদেশিক পরিষদের ২১ টি আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি।

আওয়ামী লীগ ছয় দফা ও এগার দফার ভিত্তিতে এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে আওয়ামী লীগ। জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসন লাভ করে এই দল। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৪৪ টি আসনের মধ্যে জুলফিকার আলী ভূট্টোর পাকিস্তান পিপল্স পার্টি ৮৮ টি

আসন লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ টি (১০ টি মহিলা সংরক্ষিত আসন ছাড়া) আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮ টি আসনে জয়লাভ করে। এভাবে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয় আওয়ামী লীগ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানিদের আশা আকাঙ্খা সফল হয় না। নির্বাচনে জিতলেও আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা দিতে দ্বিধা করতে থাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনীতিবিদগণ। এই ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচনা করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব

বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীন সর্বোভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে বিভিন্ন দিক থেকে নিবৃাচন অপরিসীম ভূমিকা রাখে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি প থেকেই বাঙালি জাতি, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভিত্তিে বাঙালির যে স্বাতন্ত্র্যবোধ এ নির্বাচনে এর স্বীকৃতি পাওয়া যায়। বাঙালির স্বায়ত্তশাসন দাবির বৈধতার প্রমাণ করে। এর ফলে ভাষা ভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ সুদৃঢ় ভিত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের বিজয়ের মাধ্যমে এ দলটির নেতৃত্বে জাতি মেনে নেয়। সর্বোপরি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এ নির্বাচনে আপরিসীম ভূমকা রাখে। যদিও ১৯৭১ সালের মার্চের শুরুতে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় বাঙালি জাতি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে।

পাকিস্তানি শাসক ও ভূট্টোর ভূমিকা

ইয়াহিয়া খান ও ভূট্টোর গোপন ষড়যন্ত্র

জুলফিকার আলী ভূট্টো ছিলেন পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টির নেতা। তাঁর দল জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ৮৮টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নির্বাচনের ফলাফল আওয়ামী লীগের পক্ষে যাওয়ায় ইয়াহিয়া খান ও ভূট্টো গোপন ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য পূর্ব পাকিস্তানিদের হাতে যাতে ক্ষমতা না যায়। ষড়যন্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন এবং ১২ ও ১৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বৈঠক করেন। তিনি সাংবাদিকদের কাছে শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভাবি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মন্তব্য করেন। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা গেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন না ডেকে সময় ক্ষেপন করছেন। অবশেষে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা হয় ৩ মার্চ। কিন্তু ভূট্টো ঘোষণা করেন ছয় দফা দাবির পরিবর্তন না করা হলে তিনি অধিবেশনে যোগ দেবেন না। ইয়াহিয়া খান ভূট্টোর পরামর্শে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ হঠাৎ করে অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে দেন। ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানিদের মর্মাহত করে। তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচিসমূহের মধ্য দিয়েই এ দেশ মুক্তিযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও নির্দেশনা

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও অসহযোগ আন্দোলন

এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্বের আসনে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বুঝেছিলেন, স্বাভাবিক পথে পাকিস্তানিরা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। আন্দোলনের মাধ্যমে তা আদায় করে নিতে হবে। তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে ২ ও ৩ মার্চ হরতাল এবং ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে জনসভার কর্মসূচি দেন। যথাসময়ে হরতাল কর্মসূচি পালিত হয়। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশের পর আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বে ডাকসু নেতৃবৃন্দ প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতকা উত্তোলন করেন। এই দিনে হরতাল চলাকালে মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে মানুষ আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ধাপে ধাপে আন্দোলন এগিয়ে নিতে থাকেন বঙ্গবন্ধু। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ৩ মার্চ পল্টনের জনসভায় 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র প্রচার করে। সভা থেকে বঙ্গবন্ধু ২-৬ মার্চ প্রতিদিন ভোর ৫-২ টা পর্যন্ত হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই অবস্থাকে সামাল দিতে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার তারিখ নির্ধারণ করেন। এই সময় লেফট্যানেন্ট জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ও গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। অবশেষে আসে ৭ মার্চ। রেসকোর্সের বিশাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানান। দেশকে মুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন তিনি। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল প্রেরণা পাওয়া যায় ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে। এ সভাতেই তিনি অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ ভাষণ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা পাগল জনগণের সর্বাত্মক অসহযোগিতার কারণে সকল সরকারি কর্মকান্ড প্রায় অচল হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগ সদর দপ্তর হতে জারিকৃত আদেশ বলে পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসন চলতে থাকে। ১৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনার জন্য ৩৫টি বিধি জারী করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা

এদিকে ইয়াহিয়া খান তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৫ মার্চ ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা শুরু করেন। ভূট্টোকেও ডেকে আনা হয় এই আলোচনায়। ভূট্টো ছয় দফার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা জটিল করে তোলেন। আসলে এভাবে তারা সময় ক্ষেপন করছিলেন। আর অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আর রসদ আনা হচ্ছিল এ দেশে। এদিকে স্বাধীনতার আন্দোলন ক্রমে তীব্র হতে থাকে। চট্টগ্রামে জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে শ্রমিকরা অস্বীকার করে। ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবস। এদিন পূর্ব পাকিস্তানের ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলা হয়।

২৫ মার্চে পাকিস্তানিদের গণহত্যা

২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন। যাবার আগে সেনাবাহিনীকে পূর্বপাকিস্তানিদের উপর আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে যান। ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ মোতাবেক গভর্নর টিক্কা খানের ঘাতক সৈন্যরা ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় গণহত্যার তান্ডবলীলা চালায়। ঘাতকের নির্মম আক্রমণে প্রাণ হারায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী লে. কমান্ডার মোয়াজ্জম হোসেনসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান অধ্যাপক এবং অনেক আবাসিক ছাত্র ও কর্মচারী। বেরিকেড রচনাকারী জনতা মন্দির-মসজিদে প্রার্থনাকারী নিরীহ পথচারী, নিঃস্ব বস্তি বাসীও এ নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকারে পরিণত হয়। রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানার ই.পি.আর ঘাটি এবং রাজনৈতিক দলের কার্যালয়সমূহে আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক গণবাংলা ও ডেইলি পিপলস্ পত্রিকা অফিস পুড়িয়ে দেয়া হয়। নৃ:শংস গণহত্যার সংবাদ যাতে বিদেশে ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্য ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ২৫ জন বিদেশী সাংবাদিককে আটক করা হয়। পাকিস্তানিরা ২৫ মার্চ গণহত্যার নাম দিয়েছিল ‘অপারেশন সার্চ লাইট’। ২৭ মার্চ পর্যন্ত এ গণহত্যা চলেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়

স্বাধীনতার ঘোষণা

(১) পূর্ব পরিকল্পনা মত ২৫ মার্চের রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি পাকিস্তানের মীয়ানওয়ালী কারাগারে বন্দি ছিলেন। গ্রেপ্তারের পূর্বেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত দেশবাসীকে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার কথা প্রথম প্রচার করে আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান। দেশের জনগণ উজ্জীবিত হয় এবং যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার একটি ঘোষণা পাঠ করেন। এরপর ১০ এপ্রিল প্রবাসে অস্থায়ী সরকার গঠিত হলে সরকারের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার ভিত্তিতে জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার আহবান জানায়। এ ঘোষণায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হতে স্বাধীনতা ঘোষণা কার্যকর বলে গণ্য করা হয়। স্বাধীনতার পর সংবিধানে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস ঘোষণার মাধ্যমে একে প্রতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করা হয়।

মুজিব নগর সরকার গঠন

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ ও গণহত্যা শুরু হলে পূর্ব পাকিস্তান হতে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের অধিকাংশ সদস্য প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নেন। তারা একত্রিত হয়ে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। ১৩ এপ্রিল আগরতলায় অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের এক সভায় সরকার গঠন অনুমোদন করা হয়। ১৭ এপ্রিল অস্থায়ী সরকারের সদস্যগণ মেহেরপুরে বৈদ্যনাথ তলায় (বর্তমান মুজিব নগর) শপথ গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগের চীপ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী অস্থায়ী সরকারের (মুজিব নগর সরকার নামে পরিচিত) সদস্যদের শপথ পাঠ করান। শপথ অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র পাঠ করেন।

মুজিব নগর সরকারের সদস্য ও তাঁদের দপ্তর:

নাম	দপ্তর
শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	উপ-রাষ্ট্রপতি
তাজউদ্দিন আহমদ	প্রধানমন্ত্রী
খন্দকার মোশতাক আহমেদ	পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয়
এম. মনসুর আলী	অর্থ মন্ত্রণালয়
এ এইচ এম কামরুজ্জামান	স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়

উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন কারাগারে আটক থাকায় উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেয়া হয়। সরকারকে নীতি নির্ধারণী পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য ৯ সদস্যের একটি উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করা হয়। মাওলানা ভাসানী ছিলেন কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য।

মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও যুদ্ধে সার্বিক সহযোগিতার জন্য বিশ্বের সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানান। শত্রুর মোকাবেলা করে দেশকে মুক্ত করার জন্য দেশবাসীর প্রতিও আহ্বান জানানো হয়।

মুজিবনগর সরকার আতাউল গনি ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করে। তিনি মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত করেন। তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস এর বাঙালি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত সৈন্য ব্যাটেলিয়ান ই.পি.আর, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে গঠিত 'সেক্টর ট্রুপস' সমন্বয়ে মুক্তি বাহিনীর নিয়মিত বাহিনী গঠন করা হয়। নিয়মিত সেনা ব্যাটেলিয়ান পরে তিনটি বিগ্রেডে পরিণত হয় এবং বিগ্রেড কমান্ডার মেজর শফিউল্লাহ, মেজর জিয়াউর রহমান এবং মেজর খালেদ মোশাররফের নামের ইংরেজি আদ্যক্ষর অনুসারে বিগ্রেড তিনটির নামকরণ করা হয় যথাক্রমে এস ফোর্স, জেড ফোর্স এবং কে ফোর্স। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্র-যুব, নারী, কৃষক শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের নিয়ে গঠন করা হয় অনিয়মিত বাহিনী। অনিয়মিত বাহিনী 'ফ্রিডম ফাইটার্স', 'গণ বাহিনী' এবং 'গেরিলা বাহিনী' নামে পরিচিত।

মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনা

সরকারের অধিনস্থ উপরোক্ত নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনী ছাড়াও যুদ্ধকালীন আরও কয়েকটি বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এসব বাহিনীর মধ্যে ছিল বেঙ্গল লিবারেশন ফোর্স (বি এল এফ মুজিব বাহিনী নামেও পরিচিত), টাঙ্গাইলের 'কাদেরিয়া বাহিনী' এবং ভালুকার 'আফসার বাহিনী'। এসব বাহিনী সরকারের আওতার বাইরে নিজস্ব পদ্ধতিতে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করে।

মুক্তিযুদ্ধকে ব্যাপক, সুসংহত এবং জোরদার করার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসেই জেনারেল ওসমানী সমগ্র রনাঙ্গণকে ১১ টি সেক্টরে বিভক্ত করেন।

মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন দল ও পেশাজীবীদের ভূমিকা

বেসামরিক সরকার, শান্তি কমিটি, রাজাকার ও অন্যান্য বাহিনী গঠন

মুক্তিবাহিনীর ক্রমবর্ধমান তৎপরতা এবং বর্হিবিশ্বে পাকিস্তান বিরোধী মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১২ আগষ্ট গভর্নর টিক্কা খানের স্থলে প্রবীন রাজনীতিবিদ ডাঃ আব্দুল মালিক মোত্তালিবকে গভর্নর নিয়োগ করেন। ডা. মালিকের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি বেসামরিক সরকার গঠন করা হয়। পাকিস্তান সমর্থক রাজনীতিবিদদের ও ধর্মভিত্তিক দল জামায়াতে ইসলাম নেজামে ইসলামী, পিডিপি, মুসলিম লীগের সমন্বয়ে একটি শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। দেশব্যাপী এর শাখা কমিটি গঠিত হয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগি সংগঠন হিসেবে 'রাজাকার', 'আলবদর', 'আল শামস' বাহিনী গঠন করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি সর্বজনীন গণযুদ্ধ। বাংলাদেশের ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক, বিভিন্ন পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীসহ সমাজের সর্বস্তরের নারী-পুরুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারীসহ বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাংলাদেশীরাও বিদেশী সমর্থন আদায় এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের সমর্থন ও সাহায্য

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে। মস্কোপন্থী বামদলসমূহ ও এর অঙ্গসংগঠনগুলো প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখে। চীনের বিরোধিতার কারণে পিকিং পন্থী বামদলগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। জামাতে ইসলামী ও মুসলিম লীগসহ কতিপয় রাজনৈতিক দলের নেতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা এবং যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদারদের সহযোগিতা করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রতিবেশী দেশ ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহের সরকার ও জনগণ সমর্থন ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিল। যুদ্ধের সময়

বাংলাদেশের প্রায় এককোটি লোক ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারতের সরকার ও জনগণ বাংলাদেশী শরনার্থীদের ভরণ পোষনের দায়িত্বপালনসহ সবধরণের সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিল। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের সরকার মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। তবে ঐসব দেশের জনগণের মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ছিল গভীর সহানুভূতি ও সমর্থন। ভূটান বাংলাদেশকে প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণ

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকেই কুষ্টিয়া, দিনাজপুর ও যশোরের বিস্তৃর্ণ অঞ্চল হানাদার বাহিনীর দখলমুক্ত হয়। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে ৪ ডিসেম্বের ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইন্দিরা গান্ধী সরকার ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতার জন্য ভারত সরকার মিত্র বাহিনী পাঠায়। মুক্তি বাহিনী ও মিত্র বাহিনী একত্রে যৌথ বাহিনী গঠন করে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচন্ড আক্রমণ শুরু করে। ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে যশোর সেনানিবাস, সাতক্ষীরা, মাগুরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, ভৈরব, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল মুক্ত করে যৌথ বাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে চলে আসে।

বুদ্ধিজীবী হত্যা

যৌথ বাহিনীর ঢাকার উপকণ্ঠে আগমন ও ভারতীয় বিমান বাহিনীর ঢাকা আক্রমণের প্রেক্ষাপটে ১৪ ডিসেম্বর গভর্নর মালিকের নেতৃত্বাধীন সরকার পদত্যাগ করে। এসময় পাকিস্তান বাহিনী তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর ও আল শামস-এর সহযোগিতায় ব্যাপক গণ হত্যা চালায়। ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ডিসেম্বর বাংলাদেশের খ্যাতিমান শিক্ষক, চিকিৎসক ও সাংবাদিকসহ অনেক বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। হত্যাকান্ডের শিকার বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে ১৪ ডিসেম্বর 'শহীদ বুদ্ধিজীবী' দিবস পালিত হয়।

পাকিস্তানি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পন ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

যৌথ বাহিনীর দুর্বার আক্রমণে পর্যুদস্ত পাক হানাদার বাহিনী অবশেষে আত্মসমর্পনে সম্মত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তান বাহিনীর ইর্স্টান কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেণ। পাকিস্তানের পক্ষে নিয়াজী এবং যৌথ পাহিনীর পক্ষে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। এতে অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে খন্দকার উপস্থিত ছিলেন।

পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় সম্পন্ন হয়। বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পন

সার-সংক্ষেপ

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশীদের সবচেয়ে বড় অহঙ্কার। পাকিস্তানি শাসনযন্ত্রের কাছ থেকে পূর্ব পাকিস্তানিরা কোনরূপ সহানুভূতি লাভ করতে পারে নি বরং পেয়েছে বঞ্চনা আর নির্যাতন। স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়া ছাড়া তখন তাদের আর করণীয় কিছু ছিল না। ফলে বাংলাদেশীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। নয় মাসের যুদ্ধে বিপর্যস্ত করে ফেলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে ভারতের মিত্র বাহিনী সাহায্যের হাত বাড়ায়। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি অনেক বেড়ে যায়। এরই পরিণতিতে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.৮

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় বসে সামরিক শাসন জারি করেছিলেন —
   ক. ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ খ. ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ
   গ. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ ঘ. ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ

২. ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসের নির্বাচনে ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ লাভ করে—
   ক. ৮৮টি খ. ১৬৭টি
   গ. ১০০টি ঘ. ১৫০টি

৩. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা দিয়েছিলেন —
   ক. গণপরিষদের নির্বাচনে খ. ৭১-এর ২৫ মার্চে
   গ. ৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরে ঘ. ৭ মার্চের ভাষণে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট কি ছিল?
২. মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা লিখুন?
৩. বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

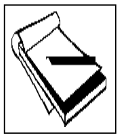

চূড়ান্ত মূল্যায়ন-১১ ঃ রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. ভাষা সংস্কার কমিটি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. ভাষা আন্দোলনের পূর্বে যে সব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল তার বিবরণ দিন।
৩. একুশে ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিন।
৪. পূর্ববাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক চক্র কিভাবে বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল তা বর্ণনা করুন।
৫. যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার বর্ণনা দিন।
৬. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচন ও এর ফলাফল আলোচনা করুন।
৭. ছয় দফা আন্দোলন কি? - বর্ণনা করুন।
৮. এগার দফা আন্দোলনের বিবরণ দিন।
৯. ১৯৫৯ এর গণ অভ্যুত্থানের পটভূমি আলোচনা করে এর প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।
১০. মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা :

পাঠ - **১১.১** ⇒	১. ক	২. খ	৩. খ
পাঠ - **১১.২** ⇒	১. ঘ	২. খ	৩. গ
পাঠ - **১১.৩** ⇒	১. গ	২. ঘ	৩. গ
পাঠ - **১১.৪** ⇒	১. ক	২. খ	৩. ক
পাঠ - **১১.৫** ⇒	১. খ	২. গ	৩. ক
পাঠ - **১১.৬** ⇒	১. খ	২. ঘ	৩. গ
পাঠ - **১১.৭** ⇒	১. ক	২. খ	৩. ঘ